Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সমকালের নিরিখে বঙ্কিম-উপন্যাসের তিন প্রতিবাদিনী

Volume	40
Issue	3
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুমিতা ভট্টাচার্য
Published online	February 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v40i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.2
Pages	39-50
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সমকালের নিরিখে বঙ্কিম-উপন্যাসের তিন প্রতিবাদিনী

সুমিতা ভট্টাচার্য

ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ না আত্মসমর্পিত একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য, আত্মসচেতনতা না আত্মবিসর্জন-বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মেয়েদের কোন রূপের সন্ধানে উৎসুক ছিলেন তাঁর কালের সমালোচকেরা? উনিশ শতকের সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চিন্তা সুখকল্পনা অপেক্ষা পতিভক্তির প্রকাশ স্বামী দেবতার সেবা-যত্নকেই যে নারীর পরমগুণ রূপে প্রশস্তি করা হত, তা আমাদের অজানা নয়, এই মাপকাঠিতে বঙ্কিম চিত্রিত নারী চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণের পরিচয় আমরা পাই বঙ্কিম-সমকালীন সমালোচনায়।

"এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ"[১] "নারী পুরুষের পত্নীমাত্র, দাসী কেন হইবে?"[২] —বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপলব্ধি শুধুমাত্র তাঁর বাচনরূপেই সীমায়িত থাকে নি, তাঁর উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির মনে আত্মসচেতনতা ও আত্ম-অধিকারের বোধ জাগিয়ে তুলেছিল। তারা আত্মপ্রকাশের তাগিদ অনুভব করেছে, খুঁজেছে নিজস্ব অস্তিত্ব। হয়তো রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুদিনী বা স্ত্রীর পত্র গল্পের মৃণালের মতো বঙ্কিমের মেয়েরা ততটাই প্রতিবাদী-ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারে নি। সমকালীন সমাজের রক্ষণশীল মানসিকতা আধুনিক-মনস্ক বঙ্কিমচন্দ্র সর্বক্ষেত্রে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁর উপন্যাসের মেয়েরা প্রচলিত সংস্কারে গড়া সামাজিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছে, তাই কখনও কখনও নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকে অবদমন করে সমাজ নির্দেশিত রীতিকে তারা আপাতভাবে মেনে নিয়েছে। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের বিবিধ সামাজিক সংস্কার সাধনের পরেও সমাজ মনে করত, মেয়েদের জীবনে শ্বশুরকুল ও পতিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও পরম তীর্থক্ষেত্র। সমাজের এই সুরটি বঙ্কিমের মেয়েদের জীবন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমালোচকদের লেখনীতে সপ্তমে বেজে উঠেছিল। তাঁরা ভারতীয় নারীর আদর্শ বা আদর্শ হিন্দু পত্নীর লক্ষণানুসারে তাদের মূল্যায়ন করেছেন। বঙ্কিম-সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু সংস্কৃতপুরাণ সংহিতায় নির্দিষ্ট পতিব্রতা নারীর মানদণ্ডে হিন্দু নারীর লক্ষণ বিচারের আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন। 'প্রচার' (১২৯৫ ভাদ্র-আশ্বিন) পত্রিকায় প্রকাশিত 'দুইটি হিন্দু পত্নী' শীর্ষক নিবন্ধে সূর্যমুখী ও ভ্রমর সম্পর্কে উক্ত "সূর্যমুখী ও ভ্রমর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ পত্নীর সদৃশ কি না একবার বুঝিয়া দেখা

আবশ্যক।" চন্দ্রনাথ বসুর এই মন্তব্য শুধুমাত্র সূর্যমুখী বা ভ্রমরের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত নারীর রূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

আদর্শ হিন্দু পত্নীর বিশেষত্ব কী? সনাতন সমাজের শিক্ষা- "সা ভার্যা সা পতিব্রতা" (শঙ্খ সংহিতা ৪।১৫)। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করছে তখন কণ্বমুনি তাকে উপদেশ দিয়েছেন, "স্বামী প্রতিকূল আচরণ করলেও পতিব্রতা পত্নী ক্রোধপরায়ণা হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না" (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-৪র্থ অঙ্ক)। হিন্দুশাস্ত্রকার নির্দেশিত মনুষ্যজীবন বিষয়ে চন্দ্রনাথ বসু যে আলোচনা করেন, সেখানে হিন্দু পত্নী সম্পর্কে তাঁর অভিমত, "হিন্দু শাস্ত্রকার সম্প্রদানরূপ কার্যের দ্বারা কন্যাকে পুরুষের নিজস্ব করিয়া দিলেন। ... পতির উদ্দেশ্যে এই আত্মত্যাগ হিন্দু রমণী বই আর কে কোথায় করিয়াছে বা করিতে পারে?"[৩] এ ধরনের মনোভাব রক্ষণশীল মানসিকতাসম্পন্ন সব সমালোচকেরই ছিল, কেবলমাত্র চন্দ্রনাথ বসুর নয়।

এই আত্মত্যাগে ও আত্মবিসর্জনে বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীচরিত্ররা কে কতটা মহৎ হয়ে উঠেছে বা ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা কার শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ন করেছে, সেই ব্যাখ্যাতেই বঙ্কিম-সমকালীন সমালোচকদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। নারীর আত্মসম্মানবোধ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও আত্মসুখের কল্পনাকে তাঁরা অনায়াসে স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা আখ্যা দিয়েছেন।

এই নিরিখে কখনও এককভাবে কখনও তুলনামূলক ভঙ্গিতে সূর্যমুখী ভ্রমর ও শৈবলিনী সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে।

জীবনের পরিণাম যাই হোক না কেন, সূর্যমুখী ও ভ্রমরের সাদৃশ্য ছিল অনেকাংশে। সূর্যমুখী ও ভ্রমর দুজনেই জমিদার বাড়ির বধূ; স্বামীর ভালোবাসার ধন এই দুই স্বামী-সোহাগিনী স্বামী-হৃদয়েশ্বরী তাদের রাজ্যপাটে দ্বিতীয় নারীর অনুপ্রবেশের কারণে সিংহাসনচ্যুত হয়। ব্যক্তিত্ববোধের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে হলেও ভালোবাসার অধিকার সম্পর্কে সচেতন সূর্যমুখী ক্ষুব্ধ ব্যথিত হৃদয়ে নগেন্দ্রনাথের জীবন থেকে সরে যাবার জন্য গৃহত্যাগিনী হয় আর বাড়িতে ফিরে আসার ইচ্ছে জানিয়ে গোবিন্দলালের লেখা চিঠির রূঢ় উত্তর দেয় ভ্রমর।

সূর্যমুখী ও ভ্রমরের জীবন থেকে শৈবলিনীর জীবন-চিত্র স্বতন্ত্র। সে জমিদারের বধূ বা কন্যা কোনোটাই নয়; অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের এই মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল তার থেকে চব্বিশ বছরের বড়ো জ্ঞানতপস্বী পণ্ডিত সাধারণ বিত্ত চন্দ্রশেখরের সঙ্গে। সূর্যমুখী নগেন্দ্রনাথ বা ভ্রমর গোবিন্দলালের মতো শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের মধুর দাম্পত্য সম্পর্কের কোনো চিত্র পাওয়া যায় না। চন্দ্রশেখর জ্ঞানসাধনায় আত্মমগ্ন'আর শৈবলিনী স্বামীর পুঁথি গুছিয়ে স্বামী পরিচর্যায় সংসারের কাজে দিন কাটায়, আপন মনে ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে তার প্রতি উদাসীন স্বামীর

মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। বিয়ের আট বছর পরে কোনো প্রত্যক্ষ তাৎক্ষণিক কারণ ছাড়াই শৈবলিনী ইংরেজ লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে স্বামী-গৃহ ত্যাগ করে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন প্রথমে সংযোজিত উপক্রমণিকা অংশ থকে পাঠক জানতে পারে শৈবলিনী বিবাহের পূর্বে বালিকা বয়সে প্রতাপ নামে তার এক জ্ঞাতি-কিশোরকে ভালোবাসত। সম্বন্ধ অনেক দূরের হলেও সমাজের নিয়মে তাদের বিয়ে হতে পারে নি। অবশ্য বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হবার সময় এই অংশটি উপন্যাসের প্রথমে ছিল না, পরে সংযোজিত হয়। সে যাই হোক, তাহলে শৈবলিনীর গৃহত্যাগের কারণ কী? পূর্ব-প্রণয়াস্পদ প্রতাপকে পাওয়ার আশা না তার প্রতি স্বামীর নির্লিপ্ততা। নিশ্চয়ই কোনো একটা অভাব বোধের তাড়নায় শৈবলিনী বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল—যা তখনকার সমাজের পক্ষে মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

সমাজ-সংসারকে অস্বীকৃতা এই তিন প্রতিবাদিনী নারী চরিত্রকে সেকালের সমালোচকমহল কীভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলেন?

যতদিন সূর্যমুখী ও ভ্রমরের স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত সীমাহীন সে পর্যন্ত সমালোচকরা তাদের প্রশংসায় হয়ে উঠেছেন মুখর, কিন্তু যখনই তারা তাদের স্বামীর অবহেলার কারণে অসন্তোষ ও প্রতিকূল মনোভাব ব্যক্ত করেছে তখনই শুরু হয়েছে কটাক্ষপাত।

রূপে গুণে অনিন্দনীয় সূর্যমুখীর প্রতি সমালোচকমহলের মুগ্ধভাব ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন আলোচনায়। 'Hindoo Patriot' (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩) পত্রিকায় সমালোচকের মন্তব্য, "She is a Personification of female devotion. Faith in husband constitutes her entire code of morals, a regard for self is a feeling unknown to her."[৪] "A woman of great beauty"[৫] বা "স্বর্গের প্রতিষ্ঠা"[৬] সূর্যমুখী তাঁদের চোখে কখনও কখনও দেবী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের "অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা"-র ভাব এ নয়, পুরুষের আত্মসুখে গড়া নারীর আদর্শ রূপমাত্র। স্বামীগতপ্রাণা সূর্যমুখীর ছবি তুলে ধরে তাঁরা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত ছিলেন। 'আর্যদর্শন' (মাঘ-ফাল্গুন ১২৮৪) পত্রিকায় এরকম আর একটা ভাব ফুটে উঠেছে, "সূর্যমুখীর নগেন্দ্রময়তা শেষে আত্মোৎসর্গে ও আত্মবিসর্জনে পরিণত হইয়াছিল। নগেন্দ্রের স্বার্থ, নগেন্দ্রের সুখ, নগেন্দ্রের জ্ঞান হইতে সূর্যমুখীর স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র সুখ ও স্বতন্ত্র জ্ঞান ছিল না।"[৭] স্বাতন্ত্র্যহীন হয়ে পুরুষের শত আঘাত সয়েও তার পদপ্রান্তে জীবন উৎসর্গ করাকেই নারী জীবনের সার্থকতা বলে সমালোচকেরা চিহ্নিত করেছিলেন।

নগেন্দ্রনাথে সূর্যমুখী নিজেকে সমর্পণ করেছিল সত্য, নগেন্দ্র ও তার সুখ একাকার হয়েছিল তাও সত্য, কিন্তু তখন স্বামীও ছিল সূর্যমুখীগতপ্রাণ। উপন্যাসের প্রারম্ভেই তার পরিচয় যাওয়া যায়–

"নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস তুফানের সময়, ভার্যা সূর্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় নৌকায় থাকিও না। নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন।"[৮]

এই স্বীকৃতি কেবলমাত্র নৌকারোহণের ক্ষেত্রেই ছিল না, সূর্যমুখীর সম্পূর্ণ অস্তিত্বেও সত্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সূর্যমুখীকে পত্নীরূপে আঁকতে চেয়েছিলেন, দাসী বেশে নয়। কিন্তু সমালোচকেরা সূর্যমুখীর ভালোবাসায় তার সুখ, আনন্দ, অস্তিত্ব অপেক্ষা নগেন্দ্রর সুখ, বিলাসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই "পতিই গতি" বোধে সূর্যমুখীর ভালোবাসাতে তার আনুগত্য, একনিষ্ঠতা সন্ধানে তাঁরা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

স্বামীর সুখের জন্য আত্মত্যাগে সূর্যমুখী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, তাই কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সে স্বামীর বিয়েও দেয়। এই আত্ম বিসর্জনে তাদের আকাঙ্ক্ষিত নারীজীবনের পূর্ণতা লক্ষ্য করে সমালোচকেরা সূর্যমুখীকে 'ধন্য ধন্য' করেছিলেন। ১২৯৮-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী' প্রবন্ধে এই মনোভাব ব্যক্ত করেন, "যে ভালোবাসায় অন্যের সুখের জন্য আত্মবিসর্জন হয়, সেই ভালোবাসার পূর্ণতা আমরা সূর্যমুখীতে দেখিতে পাই, সূর্যমুখী স্বামীসুখে আত্মহারা, স্বামীর চরণে লুণ্ঠিতপ্রাণা, স্বামীর মঙ্গলার্থে আত্মবিসর্জনসক্ষমা।"[৯]

কিন্তু সূর্যমুখী তো রক্ত মাংসে গড়া নারী, সত্যিই স্বর্গের দেবী নয়, তাই সে নগেন্দ্র-কুন্দর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেই নীরবে স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করে।

'আর্যদর্শন' পত্রিকায় কুন্দনন্দিনীর বিবাহ পর্যন্ত সূর্যমুখীর আচরণের প্রশংসা পাওয়া যায়। কিন্তু তার গৃহত্যাগের ঘটনাকে সমালোচক সুনজরে দেখলেন না, স্বার্থপরতার লক্ষণ তাঁর চোখে পড়ল। তিনি তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেন সূর্যমুখীকে, "তিনি দেখিলেন নগেন্দ্র যাহাতে সুখী, সে সূর্যমুখী নহে-কুন্দনন্দিনী। ... আজ সূর্যমুখী গৃহত্যাগিনী, কারণ আজ নগেন্দ্রর স্বার্থ সূর্যমুখীর স্বার্থ নহে। এতদিন পরে আজ সূর্যমুখী নগেন্দ্রে সহস্রগুণের সহিত একটি দোষ দেখিলেন, কারণ আজ নগেন্দ্র তাঁর প্রতি বিমুখ। আজ সূর্যমুখীর নগেন্দ্রময়তার সহিত তাঁহার স্বার্থপরতার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। স্বার্থপরতা বিজয়িনী হইল—সূর্যমুখী গৃহত্যাগিনী হইলেন।"[১০] সূর্যমুখী স্বামীকে এত ভালোবেসেও কাতর হল কেন? সে স্বামীর সুখের জন্য কুন্দনন্দিনী ও নগেন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়েছিল অবশ্যই, কিন্তু সপত্নীর সঙ্গে এক গৃহে বসবাস করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বামীর ভালোবাসা

সতীনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে একদা স্বামী সোহাগিনী পারে না। তাই তার এহেন প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। সূর্যমুখী কমলমণিকে চিঠিতে স্পষ্ট লিখেছিল, স্বামীই তার সুখ, চিন্তা, কিন্তু কুন্দনন্দিনী সেই সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। "স্বামী কুন্দনন্দিরীর হইলেন" এই সত্য অসহনীয় হওয়ায় সে নগেন্দ্রনাথের জীবন থেকে দূরে চলে যেতে চায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্যমুখী উনিশ শতকের স্ত্রী হলেও প্রতিক্রিয়ায় সে বিশ শতকের আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নারী। সমালোচকেরা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যা অনুসারে সূর্যমুখীকে নগেন্দ্রনাথের "সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্যে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় দাসী"[১১] রূপে গ্রহণ করেন তবে তার আত্মচেতনার প্রকাশকেও স্বীকার করে নেওয়া সঙ্গত। কারণ সূর্যমুখীতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ছিল বলেই সে নগেন্দ্রর যথার্থ সঙ্গিনী হয়ে উঠতে পেরেছিল।

আর্যদর্শন-সমালোচক মনে করলেন, "নগেন্দ্রের সুখ তিনি অম্লান বদনে দেখিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সে সুখের সহিত কুন্দের সুখ তাঁহার অসহনীয়। যে সপত্নীদ্বেষ স্ত্রী-সাধারণে বিদ্যমান, সূর্যমুখীর অপার্থিব হৃদয় সে পার্থিব ভাবকে আজ জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। এ পরাজয়ের কারণ আত্মবিশিষ্ট ভাবে নগেন্দ্রকে ভালোবাসা তাঁহার কখনই শিক্ষা হয় নাই।"[১২] এই ঘটনার কথা মনে করেই তিনি সূর্যমুখীর মধ্যে পাশ্চাত্য রমণীর প্রগল্‌ভতা ও সাহস লক্ষ্য করেছিলেন। যে শিক্ষা কণ্বমুনি দিয়েছিলেন শকুন্তলাকে অর্থাৎ সপত্নীর প্রতি কখনও বিরূপ আচরণ করা উচিত হয়, সেই শিক্ষারই প্রতিফলন দেখতে চেয়েছিলেন আর্যদর্শন-সমালোচক সূর্যমুখীর মধ্যে। এই একই ধরনের মনোভাব থেকে 'কল্পনা' পত্রিকার সমালোচক বলেছিলেন, "সূর্যমুখীর পতিভক্তি আদর্শ পতিভক্তি বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় দুর্বল, সেই কারণ সূর্যমুখী পতির সুখের জন্য প্রসন্ন মনে আত্মবিসর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস যে ভালোবাসা আত্মবিসর্জন শিক্ষা দেয় না, সে ভালোবাসাকে কখনই ভালোবাসার চরমসীমা বলিতে পারি না।"[১৩] সপত্নীকে সহ্য না করা, প্রসন্ন মনে স্বামীর সুখে সুখী না হওয়ার মধ্যে সমালোচকেরা বিপন্ন অস্তিত্বের মানবীয় অভিমান, যন্ত্রণা অনুভব করলেন না, দেখলেন দুর্বলতা। এঁদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্য কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, "উদারতার আত্যন্তিকতাবশত স্বামীর স্নেহ হইতে কে বঞ্চিত হতে চায়?"[১৪] "নগেন্দ্রের গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য সূর্যমুখী আদবেই দোষী নহেন। গৃহত্যাগেও সূর্যমুখীর লাবণ্যহানি হয় নাই।"[১৫]

রক্ষণশীল সমালোচকেরাও অবশ্য শেষ পর্যন্ত সূর্যমুখীর "হৃদয়ে লাবণ্যের পুনঃসঞ্চার" লক্ষ্য করেছিলেন, কারণ সূর্যমুখী 'স্বামীগৃহে' আবার ফিরে

এসেছিলেন। তাঁরা এতে সূর্যমুখীর আত্মোৎসর্গ লক্ষ্য করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন।

সূর্যমুখীর তুলনায় ভ্রমর কম আলোচিত হলেও একভাবে সে সমালোচকদের সাজানো আদর্শের ধারণায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

ভ্রমরের "ক্ষুদ্র প্রাণে প্রেমের সমুদ্র অনন্ত অতলস্পর্শ" অনুভূতির পরিচয়েও সমালোচকেরা কিছুটা অভিভূত হয়েছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'অনন্ত মুহূর্ত' (প্রচার, ১২৯৫ বৈশাখ) প্রবন্ধে বলেছেন, "সে সমুদ্রের যেখানে খোঁজ দেখিবে কেবল গোবিন্দলাল।"[১৬] কারো মতে, ভ্রমর শুধুমাত্র স্বামীর ভালোবাসার ধন নয়, আদরেরও ধন। ভ্রমর বালিকা, চপলা, আমোদপ্রিয়া হলেও জ্ঞানে বর্ষীয়সী, সহৃদয়া ও প্রেমময়ী ভার্যা। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৮৮৬ আগস্ট) গ্রন্থে ভ্রমর সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে ভ্রমরের পতিপ্রেম ও ধর্মানুরাগ এই দুই ভাবের উল্লেখ বিশেষভাবে দেখা যায়। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের অনুরাগ ও আসক্তির পরিচয় পেয়ে ভ্রমর শরবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় ছটফট করেছে। সে স্বামীকে শুধু ভালোবাসত না, সূর্যমুখীর চেয়েও স্বামীর প্রতি তার অধিকারবোধ প্রবল ছিল। ভ্রমর স্বামীর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে, তা অনেক প্রতীক্ষা ও যন্ত্রণা সহ্য করার পর। তার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উঠে আসা প্রত্যাখানে একদিকে অভিমান ও অন্যদিকে আহত ব্যক্তিত্বের জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে, "আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ি প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।"[১৭]

ভ্রমর বিষয়ে গিরিজাপ্রসন্নের বিশ্লেষণ, "ভ্রমর আর্যরমণী তাহার হৃদয়খানি সাবিত্রীর উপকরণে গঠিত। কিন্তু তাহাতে একটু পাশ্চাত্য শিক্ষাযুক্ত হইয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামীকে সকল অবস্থাতেই ভক্তি করা আমাদিগের আর্যশাস্ত্র সম্মত। ভ্রমর তাহা বুঝিত না।"[১৮] মহাভারতে তো বলাই হয়েছে, "স্ত্রীলোকের পতিই গতি" (বনপর্ব ১৯৬।৩৫)। তাই সমাজের চোখে ভ্রমর বিকৃত প্রতিপন্ন হয়। ভ্রমরের আত্মসম্মানের অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচকরা ভ্রমরের ধর্মানুরাগ, স্বামীর সুনামের প্রতি ভ্রমরের আসক্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। "সে স্বামী অপেক্ষাও তাঁহার সুনামকে বেশি ভালোবাসিত।"[১৯] ভ্রমর স্বামীর সুনামকে বেশি ভালোবাসত, না তার প্রতি স্বামীর সততার মূল্য দিত? ধর্মের অর্থ যদি ধারণ করা হয়, তবে মনে করা যায়, ভ্রমর সত্য ধারণ করেছিল বলেই স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। স্বামীর ভালোবাসা, বিশ্বাসকে সে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল, তার অবমাননার অর্থ হল ভ্রমরের সত্তাকে আহত করা।

চন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'অনন্ত মুহূর্ত' (১২৯৫ বৈশাখ) প্রবন্ধে ভ্রমরের রাগ ও তেজ বিষয়ে মন্তব্য করেন, "গোবিন্দলাল মুষ্টিভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে ... তবুও ত রাগ পড়িল না- তেজ কমিল না। এত তেজ এত রাগ দেখিলে যেন রাগ হয়।"[২০] যখন ভ্রমর স্বামীকে তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করত, তখন তার নিজস্ব সত্তা ছিল না। কিন্তু আঘাতে সে হয়ে উঠল তেজোদৃপ্তা ও স্পষ্টবাদিনী। রোহিণীর মৃত্যুর পর গোবিন্দলালের চিঠির যে প্রত্যুত্তর ভ্রমর দিয়েছিল, সেই চিঠি বিষয়ে কটাক্ষ করে শরৎচন্দ্র সরকার 'পুরোহিত' (১৩০০ ফাল্গুন) পত্রিকায় লেখেন, "এরূপ মিলিটারি ওয়াইফ্‌বৎ (military wife) পত্র কি ভ্রমরের লেখা উচিত ছিল? এরূপ পত্র না লিখিলে, গোবিন্দলালও আসিতেন—ভ্রমরও বাঁচিত সকল দিকই বজায় থাকিত।"[২১] পুরোহিত পত্রিকার সম্পাদক অবশ্য পাদটীকায় সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন, "ভ্রমর যেরূপ আন্তরিক জ্বালাতন হইয়াছিলেন, তাহাতে ঐরূপ উক্তি অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নয়।"[২২] অসঙ্গতি তো ভ্রমরের চরিত্রে নয়, সমালোচকদের 'সকল দিক' জোড়াতালি দিয়ে বজায় রাখার ভাবনায়। প্রাণাধিক প্রিয় মানুষের কাছে আঘাত পেলে শান্ত ধীরভাবে 'সকল দিকই বজায়' রাখা সম্ভব নয়। যে গোবিন্দলাল ভ্রমরের গুণকে অবহেলা করে রূপপিপাসু হয়ে রোহিণীতে নিমগ্ন হলেন, তার সঙ্গে সহাবস্থান করা দাসীর পক্ষে সম্ভব হলেও পত্নীর পক্ষে অসম্ভব। তাই ভ্রমর মৃত্যুশয্যায় স্বামীকে শেষ বারের মত দেখতে পেয়েও বলল, "আশীর্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।" জন্মান্তরে স্বামীকে পাওয়ার আকাঙক্ষা করে নি ভ্রমর, আত্মসুখ কামনা করেছে। পুরুষের আত্মসুখে অভ্যস্ত সমালোচকেরা নারীর সুখ বাসনা কি সহ্য করতে পারে? তাঁদের কাছে এ আকাঙক্ষা ভ্রমরের পুণ্যের কঠোরতা ও প্রেমের অভিমান বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে।

চন্দ্রনাথ বসু-সহ অন্যান্য সমালোচকেরা নারীর সর্বংসহা রূপ অনুসন্ধান করেছিলেন। তাই সূর্যমুখী ও ভ্রমরকে তুল্যমানে বিচার করে দেখিয়েছেন, "পতির প্রতি প্রেম ও ভক্তি সূর্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েরই সমান। ... এ ভক্তি একমাত্র হিন্দু পত্নীর ভক্তি। এ পর্যন্ত দেখিতেছি সূর্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই সমভাবে হিন্দু পত্নীর লক্ষণাক্রান্তা।"[২৩] স্বামীদের উপেক্ষায় সূর্যমুখী ও ভ্রমরের প্রতিক্রিয়ার মাত্রা অনুযায়ী স্বামীদের প্রতি তাদের ব্যবহারে ও আচরণে পার্থক্য দেখা যায়। এতে সূর্যমুখীর প্রতি সমালোচকদের সহৃদয় মনোভাবের প্রকাশ দেখি। "দুইজনেই মর্মাহত হইলেন সত্য, কিন্তু মর্মাহত হইয়া একজন পতিকে সুখী করিবার সংকল্প করিলেন। দুইটি পত্নীর দুই প্রকার আচরণের ফল বড় বিভিন্ন হইল।"[২৪]

সূর্যমুখী স্বামীর গৃহে ফিরে এসেছিল। তার আত্মসম্মানবোধ সামাজিক সংস্কারের সীমা অতিক্রম করতে পারে নি। ভ্রমরের অহংবোধের তুলনায় সূর্যমুখীর

অহংবোধ কম থাকায় চন্দ্রনাথ বসু সন্তুষ্ট চিত্তে লেখেন, "সূর্যমুখীতে যে একটু 'আমিত্ব' ছিল তাঁহার প্রেমে যে একটু স্বার্থের ভাঁজ ছিল, তাহা আর রহিল না। তাঁহার প্রেম এখন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া প্রেমের যে চরম যে আদর্শ মূর্তি তাহাই ধারণ করিল।"[২৫] আমিত্বকে সমালোচকেরা সুনজরে দেখেন নি, কারণ তাতে পুরুষের গড়া আত্মকেন্দ্রিক সুখরাজ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নারীর আমিত্বের চেতনার পরিচয়ে তাঁরা সদাশঙ্কিত ছিলেন। তাই সূর্যমুখী ও ভ্রমর হিন্দু পত্নী হলেও তাঁদের চোখে সূর্যমুখী আদর্শানুযায়ী হিন্দুপত্নী, ভ্রমর তুলনামূলকভাবে আদর্শানুরূপ নয়।

সমালোচক অনায়াসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নিজস্ব ধারণা অনুসারে,

'সূর্যমুখী যে ধাতুর পত্নী, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ধাতুর পত্নীই আদর্শ পত্নীরূপে বর্ণিত। ভ্রমর যে ধাতুর পত্নী, সে সাহিত্যে তাহার বড় বেশি প্রশংসা নাই।"[২৬]

সমালোচকেরা সূর্যমুখী ও ভ্রমর চরিত্রে আদর্শ হিন্দু পত্নীর লক্ষণ কতটা পরিমাণ আছে তার বিচার করেছেন আর শৈবলিনীকে কুলটা রমণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সোম-প্রকাশ সমালোচক[২৭] শৈবলিনী চরিত্রকে অতি 'জঘন্য' বলে অভিহিত করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'উদ্ভাবনী শক্তি' ও 'গ্রন্থচাতুরী' সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছেন। কেন যে সমালোচকের রুচিবিকার জন্মাল তার কোনো কারণ জানা যায় না তাঁর সমালোচনা থেকে। আমাদের অনুমান, শৈবলিনীর গৃহত্যাগই এই সমালোচনার কারণ। পরবর্তী সমালোচনাগুলিতে শৈবলিনীর গৃহত্যাগের বিরুদ্ধেই অভিযোগ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছিলেন। 'Calcutta Review' (১৮৭৫) পত্রিকায় প্রতাপ-শৈবলিনী বিষয়ে বলা হল, "Pratap, like a real Hero subdued, though he could never forget, his juvenile love : poor Saibalini could not."[২৭] প্রতাপকে 'Hero' আর শৈবলিনীকে 'poor' বলা হল। প্রতাপ গৃহত্যাগ করেন নি, কিন্তু রূপসী সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক টানের পরিচয় কি উপন্যাস থেকে পাওয়া যায়? প্রতাপ তো সারাজীবন ধরে শিরায় শিরায় শোণিতে শোণিতে শৈবলিনীকে ভালোবেসে রূপসীকে শুধুমাত্র করুণা করেছে।

পূর্ণচন্দ্র বসু 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় শৈবলিনীকে স্পষ্টতই 'কুলটা রমণী' হিসেবে অভিহিত করলেন। তিনি শৈবলিনীর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের প্রশংসা করেও তাকে ধিক্কার জানিয়েছেন চন্দ্রশেখরকে ত্যাগ করার কারণে। পূর্ণচন্দ্র শৈবলিনী সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছেন, তা অত্যন্ত হাস্যকর। " শৈবলিনী যদি প্রতাপকে ভুলিতে পারিবেন না, তবে চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিলেন কেন? ... যদি চন্দ্রশেখরকে

বিবাহ করিলেন, তবে সেই বিবাহে সন্তুষ্ট হইয়া কেন প্রতাপকে ভুলিলেন না, কেন চন্দ্রশেখরের পার্শ্বে চিরদিন আবদ্ধা রহিলেন না? ইহাই শৈবলিনী চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক।"২৮ সমালোচকের মতে শৈবলিনী আত্মবিসর্জন করলে ভারতীয় নারীর আদর্শ রক্ষিত হত। তাঁদের আদর্শ ছিল, মেয়েরা হয় নিজের ইচ্ছে পূরণ না করে নীরবে সংসার করবে কিংবা আত্মবিসর্জন করে মহৎ হয়ে উঠবে। ইহসংসারে তাদের নিজস্ব কোনো সত্তার প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নয়। পূর্ণচন্দ্রের অভিযোগ অনুসারে সত্যিই উনিশ শতকের কোনো মেয়ের পক্ষে বিয়ে করা বিষয়ে নিজস্ব মতামত দেওয়া সম্ভব ছিল কি? আজও কোনও কোনও শিক্ষিতা স্বনির্ভর মেয়েরও বাবা-মা নির্বাচিত পাত্রকে অনিচ্ছায় বিয়ে করার ঘটনা বিরল নয়। সমালোচকের এই পরস্পরবিরোধী ভাবনাতে সঙ্গতি নেই, অযৌক্তিক নৈতিকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর মাধ্যমে নারীমনের সচেতনতার প্রকাশ দেখিয়েছেন। একরকমভাবে সমাজের বিবাহপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর অনাস্থার ভাবও লক্ষ্য করা যায়। তাই আমাদের প্রশ্ন, শৈবলিনী কি শুধুমাত্র প্রতাপকে পাবার আশায় চন্দ্রশেখরকে ত্যাগ করেছে? না হয় সে প্রতাপের আশায় 'কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য' হয়েছে, গৃহধর্মে মন রাখতে পারে নি। প্রায়শ্চিত্ত শেষে স্বামী-গৃহে ফিরে আসার পরও প্রতাপ পৃথিবীতে থাকলে তার সুখ নেই, একথাও শৈবলিনী বলেছে। শৈবলিনীর এই ধরনের আচরণে তার নিজের প্রতি ভালোবাসা নিজের সুখের চিন্তাই বিশেষভাবে প্রকটিত। তাই আমার ধারণা, চন্দ্রশেখর যদি শৈবলিনীর প্রতি উদাসীন না থেকে মনোযোগী হতেন, তাহলে লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে সে গৃহত্যাগ করত না। চন্দ্রশেখর কখনও শৈবলিনীকে অবহেলা বা অসম্মান করেন নি। কিন্তু জ্ঞান অর্জন তাঁর জীবনের পরম ধর্ম হওয়ায় সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হতে চান নি। এই দাম্পত্য-জীবনে অতৃপ্তিও শৈবলিনীর গৃহত্যাগের যে একটা বড় কারণ, তার আভাস বঙ্কিমচন্দ্রের কুশলী চিত্রণ থেকে পাওয়া যায়। ভীমা পুষ্করিণী থেকে দেরি করে ফিরে চন্দ্রশেখরের মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াস, নিদ্রিত শৈবলিনীকে দেখে চন্দ্রশেখরের অনুতাপ আর লরেন্স ফস্টকের নৌকায় সুন্দরী শৈবলিনীর কথোপকথন দাম্পত্য জীবনের অসম্পূর্ণতার কি পরিচায়ক নয়? শৈবলিনী তো সুন্দরীকে স্পষ্টই জানিয়েছে, কোন সুখের আশায় সে স্বামী-গৃহে ফিরবে? শৈবলিনী নিজেকে ভালোবাসত, তাই অন্যান্য মেয়েদের মত স্বামী সেবায় নিজেকে সারাজীবন সমর্পিত রাখতে পারে নি, আট বছর সে কাটিয়েছে স্বামীর সংসার কাজে। তারপর নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যই শৈবলিনী প্রতাপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু নারীর ভালোবাসার মূল্য, মেয়েদের আত্মসুখের মর্যাদা দিতে সেকাল নারাজ ছিল। তাই তাঁদের বিচারে, দলনীর চিত্রে মহৎ, গৌরবময়। পূর্ণচন্দ্রের মতে, শৈবলিনী কলঙ্কিনী হয়েও নিরপরাধিনী আর দলনী কলঙ্কিনী না হয়েও অপরাধিনী। দলনী

তো স্বামী নবাব মীর কাশেমের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছিল, দলনী স্বামীর হৃদয়েশ্বরী হয়ে তাঁকে জয় করেছিল। শৈবলিনী তো তা পারে নি। দলনীর নির্বাসন ও মৃত্যু, পরিস্থিতি জনিত ভুল বোঝাবুঝির কারণে ও গুরগণ খাঁ মহম্মদ তকি খাঁর ষড়যন্ত্রে স্বামীর বা প্রেমাস্পদের প্রেমহীনতায় নয়। সমালোচকদের মতে, বিবাহের আগের ভালোবাসা যদি পরিণয়ে না পৌছয় তাহলেই কুফল অনিবার্য। তাঁরা মনে করেন, শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের আট বছরের দাম্পত্য জীবনে প্রতাপের সম্পর্কে শৈবলিনীর অনুরাগ গোপন রাখার কারণ, "পাঠক যেরূপ কৌতূহল পরতন্ত্র এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শৈবলিনীর ভাগ্য দেখিতেছিলেন, সেইরূপ ভাব কখনই উদ্রিক্ত হইত না।"[২৯] সম্ভবত চন্দ্রশেখর বা প্রতাপ শৈবলিনীর জীবনের উদ্দেশ্য নয়, তার নারীসত্তা যে কোনো একজনকে কেন্দ্র করে উন্মোচিত হতে চেয়েছিল। ভালোবাসায় নিজেকে বিকশিত করতে চেয়েছিল আত্মসমর্পণ বা আত্মবিসর্জন শৈবলিনীর ভালোবাসার নাম নয়, ঐহিক সুখেই তার পরিতৃপ্তি।

আর এক সমালোচক লোকনাথ চক্রবর্তী শৈবলিনীকে 'কুলটা' অপবাদ দেবার জন্য পূর্ণচন্দ্র বসুর সমালোচনা করেন 'আর্যদর্শন' পত্রিকাতেই (১৮৭৭ আগস্ট)। তাঁর মতে, শৈবলিনী সমাজের পবিত্র নিয়ম ভঙ্গ করেছে, না বুঝে লোকধর্মের বিরুদ্ধাচারিণী হয়েছে, কিন্তু তার জন্য তাকে ফলস্বরূপ প্রায়শ্চিত্তও করতে হয়েছে। কিন্তু এখানেও শৈবলিনীর ব্যক্তিত্বকে একরকম উপেক্ষা করেছেন লোকনাথ চক্রবর্তী। শৈবলিনী আট বছর স্বামীগৃহে থাকার পর না বুঝে স্বামীকে ত্যাগ করল? কোন কোন সমালোচক আবার মনে করেছেন, চন্দ্রশেখরকে বিয়ে করে শৈবলিনী সুখে দিন কাটাতে চেয়েছিল। "যে প্রথম প্রণয়ে বাধা পাইয়া ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, 'সৌন্দর্যের ষোলকলা' প্রকটন করিয়া সর্বজন সমক্ষে সন্তরণে গঙ্গাপার হইয়াছিল, যাহার ন্যায় নির্ভীকা, নির্লজ্জা, তেজস্বিনী রমণী প্রকৃত জীবনে দুর্লভ, বাক্যেও বিরল প্রাপ্য সে কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহে সম্মত হইয়াছিল? কখনই নহে।"[৩০] তাহলে তো সমালোচকের অভিমত অনুসারে এটাই-প্রমাণিত হয়, শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে বিয়ে করে নিজের মনের মত একটা সুখের সংসার গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু উদাসীনকে সুন্দরী প্রাণচঞ্চল নারী কতদিন ভালোবাসতে পারে?

শেষপর্যন্ত সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষাহেতু বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে স্বামী-গৃহে ফিরিয়ে এনেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আধুনিক মনোভাব শৈবলিনীকে নারী স্বাধীনতার যুগে পৌছে দিয়েছিল আর রক্ষণশীল চিন্তাভাবনা শৈবলিনীকে আবার ফিরিয়ে নিয়েছে নিশ্চিত আশ্রয়ে চিরাচরিত সংস্কারের ঘেরাটোপে।

রক্ষণশীল সমাজ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা করে পূর্ণচন্দ্র বলেছিলেন, "শৈবলিনীর ন্যায় কোন রমণীর চিত্র, আমাদিগের তরুণীগণের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে আমরা সাহসী হই না, পাছে তাহারা শৈবলিনীর দৃষ্টান্তে আপন আপন

চন্দ্রশেখর ত্যাগ করিয়া এক এক জন প্রতাপের সঙ্গে বাহির হইয়া যান।"৩১ পুরুষতন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য অবদমিত নারীর 'আপন ভাগ্য জয়' করবার প্রয়াসে যাঁরা ভীত ছিলেন, তাঁরাই এই 'গেল গেল' রব তুললেন।

শৈবলিনী স্বামীকে দেখতে চেয়েছিল, তাতেও সমালোচকদের কটাক্ষপাত কম হয়নি। "সে প্রণয়পাত্র প্রতাপ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া পুনর্বার আপনাকে দেবোপম পতির চরণে পড়িয়া কি বলিতেছে শুনুন 'মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল।' এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহার আবার স্বামী দেখিবার সাধ কি?"৩২ শৈবলিনী প্রতাপকে ভালোবাসলেও বা স্বামীর ঘরে ফেরা সম্পর্কে তার মনে প্রশ্ন জাগলেও চন্দ্রশেখরকে সে কখনও অশ্রদ্ধা করে নি। জ্ঞানী পণ্ডিত এই মানুষটিকে নিজের মনের মতন করে না পেলেও, সুন্দরীর ভাষায় 'খেলাঘরের' পুতুলের মত স্বামীর আদর না পেলেও চন্দ্রশেখরকে শৈবলিনী যথোচিত সম্মান করেছে।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত আদর্শ নারীর কল্পনা ভেঙে সচেতনা নারীচরিত্র অঙ্কন করতে পেরেছিলেন। আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি স্বতন্ত্র হলেও ব্যক্তিসত্তার মুক্তির আকৃতি ছিল সকলেরই। অসহায় মানবাত্মার ক্রন্দন কখনও প্রবলভাবে ধ্বনিত হয়েছে, কখনও মৃদুস্বরে ব্যঞ্জিত হয়েছে। পতি অনুরাগের জন্য বা স্বামীকে শ্রদ্ধা করার কারণে মেয়েরা স্বামীর অনাদর বা নির্লিপ্ততাকে বরণ করে নেয়নি। কিন্তু বঙ্কিমের কালের অধিকাংশ সমালোচকই নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে তুচ্ছ করে পতিভক্তির একনিষ্ঠতার মানদণ্ডে তাদের নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন।

পাদটীকা

১. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ", কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র দ্র, পৃ. ১২
২. বঙ্কিমচন্দ্র, "সাম্য", বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ, সাক্ষরতা প্রকাশন পশ্চিমবঙ্গ নিরাক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, পৃ. ১১৯
৩. 'হিন্দুপত্নী', 'বঙ্গদর্শন', মাঘ ১২৮৯, রিফ্লেকট পাবলিকেশন, ১৯৮২, পৃ. ৩১৮
৪. পৃ. ৩৫২
৫. 'Bengal Magazine' সেপ্টেম্বর ১৮৭৩, পৃ. ১৪১
৬. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী', 'ভারতী ও বালক', ফাল্গুন ১২৯৫, পৃ. ৬৫৭
৭. পৃ. ৪৫৯
৮. 'বিষবৃক্ষ', বঙ্কিমরচনাসংগ্রহ, উপন্যাস খণ্ড, পৃ. ২০৯

৯. পৃ. ৭৫

১০. পৃ. ৪৬২

১১. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী', 'ভারতী ও বালক', ফাল্গুন ১২৯৫, পৃ. ৬৫৮

১২. মাঘ-ফাল্গুন, ১২৮৪, পৃ. ৪৬২

১৩. 'বাঙ্গালায় উপন্যাস লেখক', চৈত্র-আষাঢ় ১২৯৫-৯৬, পৃ. ১৫৫

১৪. 'ভারতী ও বালক', ফা. ১২৯৫, পৃ. ৬৫৫

১৫. ঐ পৃ. ৬৫৬

১৬. পৃ. ১৫

১৭. 'কৃষ্ণকান্তের উইল', বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, পৃ. ৫৪৯

১৮. গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ৭২

১৯. ঐ , পৃ. ৭২

২০. পৃ. ১৫-১৬

২১. পৃ. ১৮৭

২২. পৃ. ১৮৭

২৩. 'প্রচার', ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৫, পৃ. ২১৩

২৪. ঐ , পৃ. ২১৩

২৫. ঐ , পৃ. ২১৪

২৬. ঐ , পৃ. ২১৯

২৭. P. xii.

২৮. পৃ. ১৩৪

২৯. পূর্ণচন্দ্র বসু, 'শৈবলিনী', 'আর্যদর্শন', বৈশাখ ১২৮৪, পৃ. ৩৭

৩০. শ্রীল (জনৈক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বাবু), 'চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী', 'আর্যদর্শন', পৌষ ১২৮৪, পৃ. ৪১০

৩১. পূর্ণচন্দ্র বসু, 'শৈবলিনী', 'আর্যদর্শন', আষাঢ় ১২৮৪, পৃ. ১৩৪

৩২. 'চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী', 'আর্যদর্শন', পৌষ ১২৮৪, পৃ. ৪০১